ভারতীপ্রাণামাতাজীর কথা

প্রব্রাজিকা প্রেমপ্রাণা

শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপায় কয়েক বছর পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা-মাতাজীর সেবা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁকে আমরা 'মা' বলে ডাকতাম। মার ঘরে মঠবাসিনীরা প্রত্যহই সমবেত হতেন এবং মা তাঁদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করতেন। অনেক সময় তিনি পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করে শ্রীশ্রীমা, গোলাপ মা, যোগীন মা, শরৎ মহারাজ প্রমুখ সম্পর্কে কত কথা বলতেন। আমার বিভিন্ন দিনের দিনলিপি থেকে সেইগুলি একত্র করে তুলে দিলাম। মা তো নিজের জীবনের ঘটনাপরম্পরা বলবেন ভেবে ক্রমান্বয়ে বলে যাননি, যেদিন যেমন প্রসঙ্গ উঠেছে তেমন বলেছেন। তাই তারিখ উল্লেখ করে করে মার কথাগুলি উদ্ধৃত করলে ঘটনাক্রম বিপর্যস্ত হয়ে যায়, এত বছর পরে ইতিহাস অনুধাবনের পক্ষে সেটি অসুবিধাজনক। তাছাড়া একই ঘটনা মা বিভিন্ন দিনে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে একাধিকবার বর্ণনা করেছেন। সেক্ষেত্রে একই ঘটনা সম্পর্কে সবগুলি স্মৃতিচারণ সম্মিলিত করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করলেই ভাল। তারিখ দিয়ে এক-এক দিনের টুকরো টুকরো কথা উল্লেখ করা থেকে এই কারণেই বিরত হয়েছি। এযাবৎ অপ্রকাশিত কথাগুলিই এখানে সাজিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি, তবে যেসব ক্ষেত্রে স্মৃতিকথার সামঞ্জস্য রক্ষা ও শূন্যস্থান পূরণের জন্য কিছু কিছু প্রকাশিত তথ্য উল্লেখ না করলেই নয় সেখানে সেগুলি দেওয়া হয়েছে। এইভাবে দিনলিপি থেকে মার একটি আত্মকথা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিজ পূর্বজীবনের স্মৃতিচারণের মতো, নানান প্রশ্নের উত্তরে মা যে-সৎপ্রসঙ্গ করতেন তারও কিছু অংশ এই প্রবন্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে।

ভারতীপ্রাণামাতাজীর আত্মকথা

আমি ও সুহাসিনী বলে একটি মেয়ে আগে ক্রিশ্চান স্কুলে পড়তাম। আমাদের বাড়ির সামনেই সিস্টারের স্কুল ছিল। তখন সবে হয়েছে। সিস্টারের স্কুলে তিনবার করে ক্লাস হত। সকাল সাতটা থেকে দশটা, বারোটা থেকে তিনটে ও সাড়ে তিনটে থেকে ছটা পর্যন্ত। আমরা সকালে সিস্টারের স্কুলে আর দুপুরে ক্রিশ্চান স্কুলে যেতাম। আমাদের ওই স্কুলের ঝি নিয়ে যেত ও দিয়ে যেত। একদিন সে স্কুলের দিদিমণিকে বলে

দিল যে আমরা সিস্টারের স্কুলে যাই। তখন স্কুলের ছুটির পর আমাদের দুজনকে ক্লাসে দাঁড় করিয়ে দিল, ঘরে তালা দিয়ে দিল। ঝিকে বলে গেল—ওরা যদি ওই স্কুলে আর না যায় তবেই ওদের ছেড়ে দিয়ো। ঝি সকলকে পৌঁছে দিয়ে আমাদের ঘরের চাবি খুলে বলল—তোমরা আর যাবে? আমি কিছু বললাম না। সুহাসিনী কেঁদে ফেলল, বলল—আর যাব না। তখন আমাদের ছেড়ে দিল।

ব্যস্, তার পরদিন থেকে আমি আর ওই স্কুলে যাইনি। সিস্টারের স্কুলে যেতাম। পড়াশুনা, খেলাধূলা ও ভালবাসা ছাড়া সেখানে আর কিছু ছিল না। আমাদের একদিন সিস্টার বেলুড় মঠে নিয়ে গেলেন। সেই প্রথম বেলুড় মঠ দেখি। নৌকা করে যাই। প্রথমে ঠাকুরঘরে প্রণাম করি। সাধারণ উৎসব। আমাদের হাতে কিছু প্রসাদ দিলেন, খেলাম। তার আগে স্বামীজীর ঘরে গিয়ে প্রণাম করি। স্বামীজীর চোখ দুটি বেশ মনে আছে। বেশ বড় বড় চোখ। লম্বা ও বেশ ফরসা, তবে গৌরবর্ণ নয়। পুরনো মন্দিরের নিচের রকে প্রসাদ পেতে বসলাম। খিচুড়ি, একটা তরকারি, কুলের অম্বল ও বোঁদে। খেয়ে দেয়ে সাধুদের ঘাটে আঁচাতে গেলাম। তারপর খেলা। বিকেলবেলায় সিস্টার বললেন—চলো। আমরাও চলে এলাম।

আমরা যখন স্কুলে পড়ি, সাধুরা অনেকেই স্কুলে আসতেন। সিস্টারের সঙ্গে দেখা করে চলে যেতেন। আমরা নিচে পড়াশুনা বা খেলা করতাম। সিস্টার থাকতেন দোতলায়। যখন কোনও সাধু আসতেন, নিচের দালানে একটা বড় ঘণ্টা থাকত—ওটা বাজাতেন। সিস্টার উপর থেকে বলতেন, 'Who?' যিনি এসেছেন তিনি নিজের নাম বললে সিস্টার বলতেন, 'Come in'। ব্যস্, উনি উপরে চলে যেতেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলতেন।

শরৎ মহারাজকে বেশ মনে ছিল—উনি স্কুলে গীতাপাঠ করতেন কিনা! ওঁকে বেশি দেখেছি।

ভগিনী নিবেদিতা

১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম নিবেদিতা স্কুলে যাই আর ওই বছর জুলাইতেই স্বামীজীর শরীর যায়। আর তখন উনি খুব অসুস্থ, বেশি আসতেনও না। তাই স্বামীজীকে বেশি মনে নেই।

শরৎ মহারাজ যখন স্কুলে গীতাপাঠ করতে আসতেন তখন আমি তো খুব ছোট। সিস্টার বসতেন, আমি তাঁর কোলের কাছে বসতাম। আর সামনে মহিলারা সব চিকের ভিতর বসতেন। উনি ব্যাখ্যা করতেন, কিছুই বুঝতাম না। সিস্টারের কোলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তাম। শেষ হলে সিস্টার কোলে করে আমাকে বাড়িতে দিয়ে যেতেন।

অনেক পরে ঘটনাচক্রে একবার কাশীতে সেবাশ্রমে লোকের দরকার হলে আমাকে এখান থেকে পাঠানো হয়। হরি মহারাজ তখন ওখানে ছিলেন। বিশেষ কথা বলতেন না। তারপর একদিন শরৎ মহারাজ চিঠি দিলেন যে আমাকে জয়রামবাটী

যেতে হবে। মার ওখানে খুব অসুখ তাই আমায় যেতে বলেছেন। হরি মহারাজের কাছে গিয়ে বললাম—মহারাজ আমাকে চিঠি দিয়েছেন জয়রামবাটীতে মার কাছে যেতে হবে, কাল যাচ্ছি। প্রণাম করলাম। হরি মহারাজ বললেন—বেশ বেশ। মা যখন ডেকেছেন নিশ্চয় যাবে। জয় মা, জয় মা, জয় মা। এমন ভাগ্য আর হবে না। জগজ্জননী তিনি। তাঁর কাছে তুমি যাবে—কত ভাগ্য!

ভাবে কেমন হয়ে গেলেন। কেবল বলছেন—জয় মা, আর ভাবে বিভোর হয়ে যাচ্ছেন। মাকে এঁরা সাক্ষাৎ ভগবতী-রূপে দেখতেন।

পারুল

পরে যখন স্কুলে থাকি, মাকে দর্শন করতে যাই প্রায়ই। একদিন মা বললেন—তুমি আমার কাছে থাকবে। বললাম—মা, আমার কি এমন ভাগ্য হবে? যোগীন মা এই সময়ে এসে বললেন—বেশ তো, ও থাক না তোমার কাছে। থাকলে তো ওরই ভাল হবে। তা আমি যেখানে থাকি সেখানে বলে আসতে হবে তো! তাই আমি বললাম—কাল আসব। আর তার পরদিনই আমি চলে এলাম স্কুল থেকে মার কাছে। সেই থেকে মার কাছেই থাকি।

শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দেখি আট-নয় বছর বয়সে। আর মার কাছে থাকি সতেরো বছর বয়স থেকে। দীক্ষা মার কাছেই, উদ্বোধনে ওই মার ঘরেই, ১৯১১ সালে। মা রাত তিনটের সময় উঠে পড়তেন। তারপর মুখহাত ধুয়ে কাচা কাপড় পরে জপ করতে বসতেন। ঠাকুর তুলে আবার জপ করতেন—ছটা পর্যন্ত।

আমি মেঝেতে শুতাম। মা যখন উঠে গুলের টিনটি টেনে নিতেন (মা 'গুল' দিয়ে দাঁত মাজতেন) তখন আমার ঘুম ভেঙে যেত। বাইরে হ্যারিকেন থাকত। আমি উঠে হ্যারিকেন তুলে ধরতাম। মা ঠাকুরপ্রণাম করতেন। তারপর কাপড় বদলাতেন।

মা বলতেন ঠাকুরের কথা—তিনি কেমন সুন্দর ছিলেন! সন্ধ্যার পর মা উদ্বোধনের ওই ঘরে শুয়ে পড়তেন আর আমি পা টিপে দিতাম। তখন মা খুব ঠাকুরের কথা বলতেন।

আমার মনে কোনও প্রশ্ন উঠত না। মার কাছে মেয়ে যেমন থাকে, আমিও সেইভাবে থাকতুম। আর খুব আনন্দে থাকতুম। কোনও দুঃখ বা প্রশ্ন ছিল না।

উদ্বোধনে মায়ের জন্মদিন হত। ১৯১৮ সালে শরৎ মহারাজ মাকে বললেন—ভক্তেরা আপনার জন্মদিনে একটু আনন্দ করতে চায়। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে এবার করি। মা বললেন—বেশ তো করো। তা সেবারই খুব ঘটা হয়। উদ্বোধনের ছাদে ত্রিপল খাটানো হল। আমরা সব আগের দিন কুটনো কুটে রাখলাম। আমি অবশ্য মার কাছে থাকতাম বলে বেশি যেতে পারতাম না। খাওয়ানো হয় ছাদে। রান্না নিচে। বড় বড় সব হাঁড়ি করে খিচুড়ি ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মেয়েরাই পরিবেশন করে। ওপরের ছাদে মেয়েরা খায় আর নিচে ছেলেরা। মা একখানা বড় চাদর আপাদমস্তক চাপা দিয়ে খাটের ওপর বসলেন পা ঝুলিয়ে আর ভক্তরা সব একে একে এসে প্রণাম করল। কেউ কেউ ফুল, মালা দিল। এর পরের বছর মা জয়রামবাটীতে যান। ওখানেও জন্মদিন হয়। তারপরের বছর তো মায়ের

শরীর চলে যায়। এরপর থেকে উদ্বোধনে মেয়েরা প্রসাদ পেত আর মঠে ছেলেরা প্রসাদ পেত।

মাকে দেখে কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে মায়াতে কী ভীষণ জড়িয়ে আছেন! আর মার সংসারও তো ওইরকম ছিল। মাও এই জাগতিক মানুষের মতো কাঁদছেন। কেউ মারা গেলেন তো ডাক ছেড়ে সে কী কান্না! ব্যস ওই পর্যন্ত। তারপর যেমন সারাদিন কাজকর্ম করতেন আবার তখনই সেইভাবে করতে লাগলেন। এতেই বোঝা যায় মা সত্যিই কীরকম অনাসক্তভাবে সংসারে ছিলেন।

জয়রামবাটীতে মাকে খুব কাজ করতে হত। দেখলে মনে হত ঘোর সংসারী। কেউ কেউ তাই দেখে বলতেন—মা, আপনার এত আসক্তি কেন? মা বলতেন—মেয়েমানুষ কিনা, তাই। দু-তিন দিন বলার পর একদিন বললেন—এইরকম আর একটি দেখাও তো দেখি! বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখন শার্সিতেই চমকায়।

সেইরকম, ভগবান যখন মানুষের শরীর নিয়ে আসেন তখন তাঁকে এভাবে দেখে আসক্তই মনে হয়। আসক্তি মনে হলেও আসলে ওটাই তাঁদের অনাসক্তি।

উদ্বোধনে গোলাপ মার একটি বিড়াল ছিল। আরও অনেক বিড়াল ছিল। কিন্তু ওই বিড়ালটিকে একটু বেশি ভালবাসতেন। নিজে খেতে দিতেন পাশে বসে। বিড়ালটাও খুব সভ্য ছিল—কোনও উৎপাত করত না। কোনও ঘরেটরে ঢুকত না। ঠিক খাওয়ার সময় এসে বসত। ওকে একটা আলাদা থালায় গোলাপ মা সব মেখে দিতেন আর ও বসে বসে খেত। তারপর হয়েছে কী, একদিন সকালে রাসবিহারী মহারাজ মাকিকে [মাকু] জিজ্ঞেস করছেন—এই মাকি, বিড়ালটা কোথায় রে? মাকি কিছু বুঝতে না পেরে বিড়ালটাকে দেখিয়ে দিল। আর উনি তাকে একটা বস্তার মধ্যে পুরে খাল পার করে দিয়ে এলেন। গোলাপ মা গঙ্গাস্নান করে এসে তার খোঁজ করেন। মাকু তখন বলে, মহারাজ তাকে খাল পার করে দিয়েছেন। রাসবিহারী মহারাজ বললেন—ও আমার বিছানা নোংরা করে, ওকে বিদেয় করে ভালই করেছি। শ্রীশ্রীমা শুনে বললেন—ওমা, ও কী গো! ও খুব ভক্ত ছিল। গোলাপ খুব রাগ করবে। সকালবেলায় ওকে তাড়ানো ঠিক হয়নি।

কিন্তু প্রায় ছয় মাস পর বিড়ালটা আবার এসে হাজির। রোগা হয়ে গেছে। আবার গোলাপ মা তাকে যত্ন করেন। এর কিছুদিন পর একদিন সকালবেলায় গোলাপ মা গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে দেখেন গঙ্গার ঘাটে সে মরে পড়ে আছে। তিনি ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, গঙ্গাস্নান হয়ে গেছে। তবু তিনি বিড়ালের ল্যাজটা ধরে গঙ্গায় দিয়ে বললেন—শরীরটা গঙ্গায় যাক। উদ্বোধনে ফিরে সকলকে বললেন—গঙ্গায় দিয়ে এলাম। ও খুব ভক্ত ছিল।

সেজন্য তিনি তেরোদিনের দিন সকলকে খাওয়ালেন। বেলুড় মঠ থেকেও অনেক সাধু এসেছিলেন। সেদিন খুব গান শুনেছিলাম। মঠের সাধুরা খুব ভজন করলেন। আমরা তো আর কাছে গিয়ে শুনতে পাব না। মা আর আমরা সকলে ওপরে রয়েছি আর ওঁরা নিচে গান গাইছেন—সঙ্গে শরৎ মহারাজও রয়েছেন। কী সুন্দর সব গান—প্রাণ ভরে আছে। মা বললেন—চলো গো, একটু দেখেশুনে আসি। চিক ফেলা ছিল। চিকের ভেতর দিয়ে মা ও আমরা দেখেশুনে এলাম। ওপরে এসে মা আমাদেরকে বললেন—এ আর কী গান! ঠাকুরের মুখে যে-গান শুনেছি তাতেই প্রাণ ভরে আছে। এখনও কানে লেগে রয়েছে।

আমরা সেই তখনই খুব গান শুনেছি। আর শুনেছি কাশী ও ভুবনেশ্বরে। সূর্য মহারাজ খুব ভাল গান করতে পারতেন। অম্বিকানন্দ মহারাজ তো

যোগীন মা

খুবই ভাল গাইতেন।

আমি একবার মাত্র মার গান শুনেছি। 'ও প্রেম রত্নধন' গানটা বেশ বড়, আমার মনে নেই। মা কাশীতে যখন ছিলেন, একদিন আমি সন্ধ্যের পর তাঁর পা টিপে দিচ্ছি, তখন মা এই গানটা গাইছিলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না। এই একবারই শুনেছি।

মাকে মহারাজরা কত কাপড় পাঠাতেন। মার তাতেই জগদ্ধাত্রীপুজো হয়ে যেত। কাপড় কিনতে হত না। দুর্গাপুজোর কাপড় সব। [শ্রোতা সবিস্ময়ে বললেন—সে তো সব প্রসাদী!] প্রসাদী তো কী হয়েছে? মা সেগুলোকে জলে কেচে নিতেন। এখন হলে তোমরা বলতে—চলবে না, চলবে না।

মা আমাকে হাতের বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। বেশ মোটা, 'মকরবালা'। তাতে লাল পাথর দেওয়া। যোগীন মা, গোলাপ মা সবাই মিলে পছন্দ করে দিয়েছিলেন। আমি ওই বালা অনেকদিন ধরে পরেছিলাম। মা আমাকে একটা আংটিও দিয়েছিলেন। বালাটা কী হল জান! একদিন সুধীরাদি দেখে বললেন—মোটা মোটা বালা হাতে ভাল লাগছে না। আমাকে দাও, আমি ভেঙে চুড়ি গড়িয়ে দেব। আমি তখন অত্যন্ত বোকা ছিলাম। সুধীরাদি চাইতেই আমি দিয়ে দিলাম। মা, যোগীন মা, গোলাপ মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বালা কী হল। আমি বললাম, সুধীরাদি চুড়ি গড়িয়ে দেবেন বলে নিয়ে গিয়েছেন। মোটা মোটা বালা ভাল লাগছে না হাতে, তাই। সকলে খুব রাগ করলেন। যোগীন মা, গোলাপ মা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মা একটা জিনিস দিয়েছেন, সেটা ভেঙে ফেলবে! মা পরে বলেছিলেন, ''আমি আবার গড়িয়ে দেব।''

চুড়ি তৈরি হয়ে আসার পর তিনগাছি করে আমি পরে থাকতাম। খুব সরু সরু। মা অসুখের সময় চুড়িগুলো ধরে নেড়ে নেড়ে বলতেন, ''আমি সেরে উঠে তোমাকে আবার বালা গড়িয়ে দেব।'' আমি বলতাম, ''আগে সেরে উঠুন, পরে ওসব হবে।'' তা আর হল না। জয়রামবাটীতে রাধুর ছেলে হবে বলে মার সঙ্গে আমি গিয়েছিলুম। তখন মা কোয়ালপাড়াতে আছেন। বলতেন আমাকে একটা মোটা হার গড়িয়ে দেবেন। আমি যখন কলকাতায় ফিরে আসব, তখন মা আমার হাতে একটা মোড়া জিনিস দিয়ে বললেন, ''এখানে সকলে রয়েছে, তাই তোমাকে হার গড়িয়ে দিতে পারলাম না। তুমি কলকাতায় গিয়ে শরৎকে দিয়ে করিয়ে নিয়ো।'' আমি পরে দেখি ১০০ টাকা রয়েছে। আমি এসে সুধীরাদিকে বলি। উনি তখন বলেন, ''হার তো তুমি পরছ না, ওই টাকা স্কুলে থাক—স্কুলের কাজে লাগবে।''

পরে আমি শরৎ মহারাজকে বলাতে উনি বললেন, ''এ কী, মা তোমাকে দিয়েছেন আর তুমি কিনা দিয়ে এলে? খুব অন্যায় করেছ। যাকগে, যা হওয়ার হয়েছে। এখন তুমি মাকে চিঠি লিখে দাও

যে তুমি এই করেছ। এটা তুমি ঠিক করনি।”

চুড়িগুলো খুব ক্ষয়ে গিয়েছিল। চুড়িগুলোর টাকা এই মঠে [সারদা মঠে] দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা সবাই একসঙ্গে তেল মাখতে বসতাম গঙ্গাস্নান করতে যাওয়ার আগে। একটা ভাঁড়ে ভর্তি করে তেল নেওয়া হত আর তাতে একটা পলা দেওয়া থাকত। মা, আমি, নলিনী, মাকু, রাধু, যোগীন মা, গোলাপ মা সকলে তেল মাখতে বসতাম। একপলা করে তেল সকলে হাতে নিত। রাধু মাকু এদের খুব চুল ছিল। ওরা একেবারেই তেল মাখতে জানত না। পলা পলা করে তেল নিয়ে মাথায় মাখত আর চারদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়ত। মা নিজেই মাথায় তেল মাখতেন কিন্তু রাধু মাকুকে তেল মাখিয়ে দিতে হত। মা বলতেন—শরীরকে সামশীতলে [সমশীতলে] রাখতে হয়। সরষের তেল থাকত শিশিতে। সকলে হাতে ঢেলে মাখত। মাকে সরষের তেল মাখিয়ে দিতে হত। বেশ করে গায়ে পায়ে হাতে ঘষে ঘষে মাখিয়ে দিতাম। এইজন্য বালিশের খোলটোল সব কী চিটচিটে হত যে কী বলব! সাবান-টাবানের ব্যাপার ছিল না। যোগীন মা সোডা দিয়ে ফুটিয়ে দিতেন।

যোগীন মাকে গোলাপ মা খুব মানতেন। ঠাকুরের কাছে গোলাপ মাকে প্রথম আনেন যোগীন মা। তাই ওঁদের দুজনের খুব ভাব ও প্রীতি ছিল। দুজনেই খুব শোক পেয়েছেন আর দুজনেই বালবিধবা। গোলাপ মা ছিলেন পুরুষের মতো। ঠাকুর বলেছিলেন মাকে—একে যত্ন করো, এ তোমাকে দেখবে। বাস্তবিক মা গোলাপ মাকে ছাড়া কোথাও যেতেন না। একদিন গোলাপ মার অসুখ করেছে। মাকে গঙ্গাস্নান করাতে নিয়ে যাব আমি। মা খিড়কির দরজা দিয়ে যেতেন কিনা! ওখানে চৌকাঠ থেকে রাস্তা বেশ কিছুটা নিচু। গোলাপ মা যখন যেতেন, উনি নিজে আগে নামতেন, তারপর মার হাত ধরে নামাতেন। সেদিন আমার তো বুক

গোলাপ মা

ঢিপঢিপ করছে। কী করে ওখান থেকে নামাব মাকে! মার পা খোঁড়া ছিল কিনা বাতের জন্য! যাই হোক আমি আগেই নেমে পড়ে মার হাতটা খুব শক্ত করে ধরে নামালাম। কিছু হল না। ঠাকুরের ইচ্ছায় ঠিক হয়ে গেল।

গোলাপ মা-দের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। তাঁর মেয়েকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজে মেয়ে দেখে পছন্দ করে বিয়ে করেন। খুব বড়লোক। মেয়ের নাম চণ্ডী। মেয়ের দুই ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। তাদেরকে ছোট ছোট রেখে মেয়ে মারা যায়। পিরীলি ব্রাহ্মণ ছিলেন সৌরীন্দ্রমোহনরা। তাতে গোলাপ মা বলেছিলেন, আমাকে জাতে ঠেলবে ঠেলুক গে যাক—আমার একমাত্র মেয়ে তো সুখে থাকবে। তাই ওই মেয়ে মারা যাওয়াতে গোলাপ মা শোকে

মুহ্যমান হয়ে পড়েন। গোলাপ মার নাতি-নাতনি সব আসত তাঁর কাছে। নাতনি মারা যায়, বড় নাতি মারা যায়। তার বিধবা বউ আর ছেলে মাঝে মাঝে আসত দেখতে। ছোট নাতি ও তার বউও মারা যায়। গোলাপ মা অনেক শোক পেয়েছিলেন। তাইতে উনি ওইরকম পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

অসুখের জন্য শেষ সময়ে মা খুব খিটখিটে হয়েছিলেন, আর খুব বায়না হয়েছিল। তখন আমরা তিনজন থাকতাম—নবাসনের বউ, প্রফুল্ল, আমি। আমি একদিন রাত বারোটায় খাওয়াতে গেছি। কিছুতেই মা খাবেন না। বলতে লাগলেন—তোমার কেবল এক কথা—মা খাও আর বগলে কাঠি দাও (থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখতাম বলে)। আমি তখন বললাম মহারাজকে ডাকব—একথা শুনে যদি খেয়ে নেন! অন্যদিন মহারাজের নাম করলেই মা খেয়ে নিতেন। সেদিন কিন্তু বললেন—ডাকো তোমার মহারাজকে। দু-তিনবার বলাতে আমি পাশের ঘরে মহারাজকে ডাকতে গেলাম। কিন্তু মহারাজ ঘুমোচ্ছেন দেখে ফিরে এলাম। মা বললেন—কই তোমার মহারাজ! ডেকে আনো। তখন আবার গেলাম। পা খসখস করতেই মহারাজ উঠে পড়লেন। বললাম— মা আপনাকে ডাকছেন।

এর আগে মহারাজ কোনওদিন মাকে ঘোমটা ছাড়া দেখেননি। মহারাজের মনে একটা কষ্ট ছিল এজন্য। মহারাজ পরে আমাকে বলেছিলেন। শেষ সময়ে মা এই কষ্ট রেখে যাবেন কেন? তাই মহারাজকে ডেকে কৃপা করে গেলেন। মহারাজকে কৃপা করবেন বলেই এই ব্যবস্থা, কিন্তু তখন তো আমি অত বুঝিনি। মহারাজ আমার কথা শুনে তাড়াতাড়ি এলেন। মা তখন মেঝেতে শুতেন। মা বললেন—এসেছ বাবা, তুমি এইখানটায় বোসো। বিছানার পাশে বসতে বললেন। মহারাজ তো কাঁপছেন—বসলেন। মা মহারাজের হাতটা ধরলেন। মহারাজ মার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। মহারাজ আমাকে বললেন—দাও, এবার খাইয়ে দাও। মা তখন বললেন—না। তুমি বাবা, আমাকে খাইয়ে দাও।

মহারাজের হাতে আমি ফিডিং কাপটা দিলাম। বাটিশুদ্ধ মহারাজের হাতটা খুব কাঁপতে লাগল। উনি তখন অন্যরকম হয়ে গেছেন। আমি মার গলার কাছে ন্যাপকিনটা লাগিয়ে দিলাম। মহারাজ আস্তে আস্তে খাইয়ে দিলেন।

মার যখন শরীর যায় তখন রাত একটা-দেড়টা হবে। আর পরের দিন বেলা প্রায় দুটো-আড়াইটের সময় দাহ করা হয়। কিন্তু খুব নরম ছিল দেহ। আমি আর নবাসনের বউ যখন মাকে গঙ্গায় স্নান করাতে যাই,—সুধীরাদিও ছিলেন—তখন কোলে করে গঙ্গার জলের মধ্যে শুইয়ে বেশ ভাল করে স্নান করিয়ে দিই। বাস্তবিক তখন পর্যন্ত দেহ কী নরম ছিল তা বলতে পারি না। আর, মুখের একটুও বিকৃতি ঘটেনি। মনে হচ্ছে যেন হাসছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শরীর চলে যাওয়ার পর সকলকে

কাপড় দেওয়া হয়। আমাকে একটি [সিল্কের] কাপড় দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি নিইনি। মায়ের দেওয়া কাপড় আমার অনেক ছিল। তাছাড়া মা-ই চলে গেলেন, আর কাপড় নিয়ে কী করব? তখন আমার এসব কাপড় দেওয়াদেওয়ি ভালও লাগেনি। আমি কাপড় নিইনি বলে অনেকে বলেছিল—এর সব বাড়াবাড়ি। গণেন মহারাজ আমার ওপর রাগ করেছিলেন, শরৎ মহারাজকে বলেও দিয়েছিলেন।

মায়ের শরীর যাওয়ার পরের কথা। আমি গোলাপ মার সেবায় রয়েছি। তাঁর খুব অসুখ তখন। রাত্রে হাঁপানির টান হয়। তাই শরৎ মহারাজ আমাকে ওঁর কাছে থাকতে বলেছিলেন। আমি তখন স্কুল করে একেবারে উদ্বোধনে চলে যেতাম। আবার সকালে স্কুলে আসতাম। মহারাজ রোজ আমার জন্য খাবার রেখে দিতেন—ঢাকা দেওয়া থাকত। আমি গিয়ে খেতাম আর মহারাজ তখন চা খেতেন। সেদিন চিংড়িমাছের মালাইকারি হয়েছিল। গোলাপ মা আমার জন্য একটু রেখে দিতে বলেছিলেন। সেটাই যা একটুখানি খেয়েছিলুম, আর বিশেষ কিছুই খাইনি। গোলাপ মা, সত্যেন মহারাজ পরে যে-ঘরে থাকতেন সেই ঘরে থাকতেন। রাত্রে আমরা শুলাম। তখন রাত দুটো-আড়াইটে হবে, তখন থেকে আমার খুব বমি হতে লাগল। সেইসঙ্গে পেট খারাপ। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। এদিকে একটু শব্দ হলেই গোলাপ মার ঘুম ভেঙে যাবে—হার্টের অসুখ। তাই নিঃশব্দে, যাতে কোনও আওয়াজ না হয় সেইভাবে পা টিপে টিপে বাথরুমে যেতে লাগলাম। মা ওই বাথরুম ব্যবহার করতেন। তারপর গোলাপ মা ও যোগীন মা ব্যবহার করতেন। আমরা সব নিচে যেতাম। সেদিন ওই বাথরুমই ব্যবহার করলাম। সিঁড়ির আলো জ্বালাতেও পারছি না। অন্ধকারে কোনওরকমে রাত্রি কাটল। সকালে গোলাপ মা উঠলে পর আমি সব বললাম। উনি গঙ্গাস্নান করতে যাওয়ার সময় শরৎ মহারাজকে বলে গেলেন—সরলার খুব অসুখ। তখন প্রায় নটা হবে—মহারাজ এসে আমায় দেখলেন। আমার মাথার কাছে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। অক্ষয় ডাক্তার বলে একজন হোমিওপ্যাথ ছিলেন, ওঁকে ডাকতে পাঠালেন। তখন ঠাকুরের ভোগ উঠছে। আমি তখন একবার বাথরুমে যেতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম—একেবারে অজ্ঞান। ঝি-কে গোলাপ মা আমার সঙ্গে যেতে বলে দিয়েছিলেন। ও জল আনছিল—আমাকে পড়ে যেতে দেখে চিৎকার করে উঠল, 'দিদিমণি পড়ে গিয়েছে' বলে। তখন মহারাজরা সকলেই দৌড়ে এলেন। গোলাপ মা এলেন। আমি অজ্ঞান, কিছুই জানি মা। শরৎ মহারাজ পূর্ণানন্দ মহারাজকে ডাকলেন ও বললেন—দেখো তো, নাড়ি আছে কি না? ডাক্তার মহারাজ দেখে বললেন—হ্যাঁ আছে।

তারপর আমার যখন জ্ঞান হল, দেখি আমার মাথাটা শরৎ মহারাজের কোলের উপর। উনি আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর ঝি পাখার বাতাস করছে। আমি তো তখন বুঝতে পারছি না কোথায় শুয়ে রয়েছি। সেইসময় অক্ষয় ডাক্তার এসেছেন। আমি আর একবার বাথরুমে গেলাম, তারপর আমাকে ধরে এনে শুইয়ে দিলেন। ডাক্তার দেখলেন। মহারাজ খুব ভয় পেয়ে গেলেন—বাঁচবে তো! গোলাপ মা এইসময় বলেছিলেন—যোগীন ওকে খুব ভালবাসত, ও যোগীনের খুব সেবা করেছিল কিনা! যোগীন ওকে নিয়ে নেবে। তাহলে আমার সেবা কে করবে?

অক্ষয় ডাক্তারের ওষুধে আস্তে আস্তে সেরে গেলাম। মহারাজ এইসময় কালীঘাটের মা কালীর কাছে পাঁচ টাকা মানত করেছিলেন। যদিও এটা আমি অনেক পরে জেনেছি। একদিন আমাকে বললেন—পাঁচ টাকা বার করে ওকে দাও তো! আমি বললাম—কী হবে? মহারাজ বললেন—পুজো

দেবে, এই বেটির (আমাকে দেখিয়ে) জন্য। অসুখের সময় মানত করেছিলুম।

তখন আমি বললাম—কেন আপনি বাঁচালেন আমাকে? বেশ তো আপনার কোলে মাথা রেখে চলে যাচ্ছিলুম!

এইরকম খুব ঝগড়া করলুম। তখন মহারাজ বললেন—আমার কোলে মাথা রেখে তুমি চলে যাবে—তা কি হয়?

মহারাজ বলেছিলেন—কুকুর শৃগালের মতো না মরে একটা দাগ রেখে যাবে।

স্বামী সারদানন্দ

মার শরীর যাওয়ার পর শরৎ মহারাজই আমাদের কজনকে রাজা মহারাজের কাছে পাঠান। রাজা মহারাজ আমাদের অনেক কথা বলতেন। এই সময়েই তিনি খুব জপধ্যান ও পুরশ্চরণের কথা বলেন। আমরাও কজন খুব করি। পুরশ্চরণের নিয়ম হচ্ছে দশহাজার জপ করতেই হবে। তার কম হলে হবে না। একাসনে বসে করতে হবে এবং না খেয়ে। যতটা জপ হবে সেটা গুরুকে বলতে হবে। তারপর তিনি যেমন যেমন বলবেন সেইভাবে সব করতে হবে। রাজা মহারাজ, শরৎ মহারাজ খুব পুরশ্চরণ করতেন। শরৎ মহারাজ আমাদের করাতেন। আমরা জপ করে তাঁকে গিয়ে বলতাম—তারপর তিনি সব ঠিক করে দিতেন। মহারাজ বলতেন ঘণ্টায় আট হাজার জপ করা যায়। কিন্তু আমি চেষ্টা করেও ছয় হাজারের বেশি করতে পারিনি। মহারাজ বলেছিলেন বলে আমি প্রাণপণে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই পারিনি। দশ মিনিটে এক হাজার জপ করা যায়। কাশীতে থাকতে চলে যেতাম দশাশ্বমেধ ঘাটে, হরিশ্চন্দ্র ঘাটে, মণিকর্ণিকার ঘাটে। সেখানে গিয়ে জপ করতাম। ঠিক করে নিতাম আজ এত জপ করব—সেই জপ শেষ করে উঠে আসতাম। তাতে কখনও কখনও অনেক রাতও হয়ে যেত।

গোলাপ মা-যোগীন মার শরীর চলে যাওয়ার পর আর উদ্বোধনে রাত্রিবাস করিনি। স্কুল থেকে সব সময় মহারাজের কাছে পালিয়ে আসতাম। মহারাজের কাছে এসে আনন্দ পেতাম, শান্তি পেতাম তাই সময় পেলেই চলে আসতাম। একবার সকালে গঙ্গাস্নান করে মায়ের বাড়ি গিয়ে মাকে প্রণাম করে আসতাম। তখন মহারাজ জপ করতেন। আমি পাশে গিয়ে বসে থাকতাম। একটু পরে উনি জপ থেকে উঠতেন। জপের আসনে বসেই চা খেতেন ও খাবার খেতেন। আমি প্রণাম করতাম। আমাকে খেতে বলতেন কিন্তু আমি খেতাম না, কারণ তখনই তো স্কুলে ফিরে ভাত খাব। মহারাজও আর জোর করতেন না। কখনও কখনও বিস্কুট খেতাম। এই সময় যে যেতাম সেটা স্কুলে কাউকে বলতাম না। তারপর বিকেলে স্কুলের পর আবার যেতাম। মহারাজ আমার জন্য প্রসাদ রেখে দিতেন—যা যা সকালে উনি খেতেন সবই আমার জন্য থাকত। আমি গিয়ে সেসব খেতাম। উনিও তখন চা, বিস্কুট ইত্যাদি খেতেন। আমি একেবারে আরতি দেখে ফিরে আসতাম। মহারাজ ডাকতেন, 'হরিপ্রেম হরিপ্রেম' বলে। হরিপ্রেম মহারাজ রোজ আমাকে পৌঁছে দিয়ে

আসতেন একেবারে স্কুলের দোরগোড়া পর্যন্ত। তিনি রেডি হয়ে থাকতেন—মহারাজ ডাকলেই চলে আসতেন। তখন সকলে কত কথাই না বলেছে। উদ্বোধনে অনেকে বলত—ওই এল মহারাজের মানসকন্যা, আদরিনি নন্দিনী।

মহারাজের কাছে আমি সত্যি খুব আবদার করতাম। যা করবার ওঁর কাছেই করেছি। স্নেহ করতেন খুব। তাই আমি বললাম—শেষে না আপনার জড়ভরতের মতো অবস্থা হয়। মহারাজ বলেছিলেন—তাই নাকি? একটু হেসেছিলেন। পরে একদিন মঠে গিয়েছিলেন, কী মনে হয়েছে, ঠাকুরকে একথাটা বলেছেন যে—ও যা বলছে তা কি ঠিক? ঠাকুর বলেছেন—না ঠিক নয়। ওর মধ্যে আমাকে দেখিস তাই ওকে এত ভালবাসিস, স্নেহ করিস। ওতে কিছু হবে না।

শরৎ মহারাজ ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন—তুমি যা বলেছ তা ঠিক নয়। ঠাকুর আজ আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন।

আগে তো তাঁর সঙ্গে কথা বলতাম না। মহারাজের সঙ্গে জয়রামবাটী যাচ্ছি মার অসুখ বলে, সঙ্গে যোগীন মা ও গোলাপ মা। এক জায়গায় স্নান করতে যাব, ওঁদের কাপড় নেব বলে খুঁজছি বাক্সটা; মহারাজ দেখে বললেন—কী খুঁজছ তুমি? বাক্স খুঁজছি জেনে দেখিয়ে দিলেন বাক্সটা। সেই থেকেই কথা বলি। খুব ভালবাসতেন। আমার তো উনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। উদ্বোধনে আসতাম বলে স্কুলের সবাই আমাকে কত ঠাট্টা করত। কত কথা বলত। আমি কোনওদিকে কান না দিয়ে মহারাজের কাছে চলে আসতাম।

শরৎ মহারাজ ঠাকুরের অনেক কথা বলতেন। একবার ঠাকুর ভাবে নৃত্য করছেন—মহারাজ দেখেছিলেন যে ঠাকুর যতটা লম্বা তার থেকে অনেক বেশি দীর্ঘ এবং দেহ লঘু। রামলালদাদার কাছে শুনেছি, ঠাকুর রাত্রিবেলা শুয়েছেন, হঠাৎ বলছেন—পড়বি রে পড়বি, নেমে আয় নেমে আয়। চিৎকার করে বলতে বলতে উঠে কালীবাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় চলে এসেছেন। মা ভবতারিণীর উদ্দেশে বলছেন—পায়েতে পাঁয়জোর পরে খুব গরব হয়েছে, তাই মন্দিরের চূড়ায় উঠে পা ঝুলিয়ে বসে কলকাতা দেখা হচ্ছে!

গোলাপ মার কাছেও এইরকম দর্শনের কথা শুনেছি। একবার উনি আর মা নহবতে আছেন। ঠাকুর হঠাৎ চিৎকার করে বললেন—বড় খিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খেতে দাও। মা তাড়াতাড়ি এক কাঁসি হালুয়া করে দিলেন। গোলাপ মা হাতে করে নিয়ে ঠাকুরের ঘরে এসে দেখেন, ঠাকুর জোরে জোরে পায়চারি করছেন আর তাঁর শরীর এত লম্বা হয়ে গেছে যে মাথা কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকেছে। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে গোলাপ মার খুব ভয় করতে লাগল। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ধীরে ধীরে আগের মতো হয়ে গেলেন। গোলাপ মার হাত থেকে হালুয়ার কাঁসি নিয়ে গোল গোল করে পাকিয়ে মুখে ফেলতে লাগলেন। সবটা খেয়ে ফেললেন। একে তো পেটরোগা! শিঙি মাছ টাঙানো থাকত, তাই দিয়ে ঝোলভাত খেয়ে থাকতেন। আসলে ওই খাওয়াটা ভাবে খাওয়া কিনা তাই কিছু ক্ষতি হয়নি। গোলাপ মাকে বললেন—কী গো, ভয় করছিল নাকি? গোলাপ মা বললেন—হ্যাঁ, ভয় করছিল।

যাই হোক, শরৎ মহারাজের শরীর চলে যেতেই আমি ভেঙে পড়লাম। একমাস পরেই কাশী চলে যাই। আর আসব না ঠিক করলাম। এই শরীর আর রাখব না বলে কত চেষ্টাই না করলাম কিন্তু কই শরীর তো গেল না! শরৎ মহারাজের উপর খুব রাগ হয়েছিল—আমাকে রেখে গেলেন বলে। কাশীতে তখন বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, হরিশ্চন্দ্রঘাট—সব জায়গায় যেতুম। শ্মশানে জপধ্যান করলে শুনেছি খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্রচৈতন্য হয়—তাই ওইসব জায়গায়

যেতুম—যখন খুশি বাড়িতে আসতুম—ইচ্ছা হলে রান্না করতুম, না হলে করতুম না। গোলাপবাসিনী খুব সেবা করেছে। একদিন হয়েছে কী, সকালে বেরিয়ে আমি আর সারাদিন ফিরিনি, জপ করছি। এদিকে গোলাপবাসিনী অদ্বৈত আশ্রমে গিয়ে গণেন মহারাজকে বলে সব ঘাটে ও মন্দিরে আমাকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছে। আমি কেদারনাথে গিয়েছিলুম—সোমবার বলে একেবারে বিকেলবেলায় ফিরে খেলাম। কত চেষ্টাই তো করলুম—এই শরীরটা যাতে চলে যায়, কিন্তু কই গেল—আজও তো রয়েছি!

বৃন্দাবনে থাকতে রোজ লক্ষ জপ করতাম। কোনও কাজ তো ছিল না! সবসময়ই জপ করেছি। রাত্রে শুয়ে শুয়েও জপ করতাম—সঙ্গে মালা নিয়ে শুতাম। রান্নাবান্নার কোনও হাঙ্গামা ছিল না। একবার যমুনাতে স্নান করতে যেতাম শুধু। তারপর সেই এগারোটার সময় 'পারস' আসত—মদনমোহনের ভোগ। স্নান-খাওয়া বাদে সারাদিন শুধু জপ করতাম।

উদ্বোধনে যখন ছিলাম তখন তো জপটপ কিছুই করিনি! তখন মা, গোলাপ মা ও যোগীন মার সেবায় থাকি—সেটাই সাধনা, সেটাই তপস্যা। হয়তো কোনওদিন গঙ্গা নাইতে যাওয়ার সময় একশো আট জপ করে নিলুম। তাঁদের সুবিধে-অসুবিধের দিকে সবসময় নজর রাখতে হত। মহারাজদেরও দেখেছি যখন যে-কাজটা করতেন সাধনা হিসাবেই করতেন। বলতেনও তাই।

সন্ধেবেলায় মার পা টিপে দিতাম। তখনই হয়তো মনে মনে জপ করে নিতাম। যোগীন মার ঘরে আমি, যোগীন মা ও শরৎ মহারাজ শুতাম। একদিন মহারাজ দেখতে পেয়েছিলেন আমাকে জপ করতে। আমার তো আসন-টাসন কিছু ছিল না। আমি ভোরে উঠে বারান্দার দিকের দুটো দরজার মাঝখানে খাটের পাশে মেঝেয় বসে জপ করছি। মহারাজ আমাকে দেখতে পান; দেখে একটা আসন দিয়ে বলেন—এইটাতে বসে জপ করো। দুপুরে একটু বিশ্রাম করে আবার কাজ করতে হত। রাতেও শুতে দেরি হত। সারাদিন তো কাজের মধ্যেই চলে যেত—তখন আর জপটপের কথা মনে হত না।

যাই হোক, কাশী থেকে ফিরব ভাবিনি। তবু আবার আসতে হল। শঙ্করানন্দ মহারাজ আনালেন জোর করে। কাশী থেকে কোথাও যেতাম না বলে আমাকে সবাই পাতালফোঁড়া শিব বলত।

শরৎ মহারাজ অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মেয়েদের মঠ আর হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত মায়ের শতবার্ষিকী উৎসবের সময় বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্থির করেন মেয়েদের মঠ হবে। ভোটাভুটি হল। যে-পক্ষে বেশি ভোট পড়বে সেটাই ঠাকুরের ইচ্ছা বলে মনে করে নিতে হবে। একশো জনের মধ্যে মাত্র সাত জন মত দেননি। সাত জনই বড় সাধু—এঁদের মধ্যে ছিলেন অনঙ্গ মহারাজ, গম্ভীরানন্দ মহারাজ, সত্যেন মহারাজ। কিন্তু তাই বলে কোনও বিরূপতা ছিল না।

শ্রীশ্রীমার সেন্টিনারির সময় আমি জয়রামবাটীতে গিয়েছি। শঙ্করানন্দ মহারাজও গিয়েছেন—মার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে এবং নাটমন্দির ওপেনিং হবে। উৎসবের সময় সকলের সঙ্গে বসে তরকারি কুটছি। অনেক লোক হয়েছিল। মহারাজের সেবক এসে আমাকে বললেন—আপনাকে মহারাজ ডাকছেন। তার আগে মহারাজকে যখন সকলে প্রণাম করতে যান আমিও যাই। আমাকে উনি দেখেছিলেন। আমি যাওয়ায় মহারাজ বললেন—এসো, ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দাও। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

আমার তো খুব ভয় করতে লাগল। আমাকে আবার কী কথা বলবেন! দরজাই বা কেন বন্ধ করে

দিতে বলছেন! আগে তো কখনও এমন করেননি!

তারপর উনি বললেন—কথা হয়েছে এইরকম মেয়েদের মঠ হবে। তোমাকে আসতে হবে।

রাজি হচ্ছিলাম না। মহারাজ বললেন—না, তোমাকে আসতেই হবে। তুমি ছাড়া আর পুরনো কেউ নেই। আমি এখান থেকে ফিরে কলকাতা থেকে তোমাকে চিঠি দেব। তখন তুমি আসবে। এখন কাউকে কিছু বলবে না।

আমিও কাউকে কিছু বললাম না। সকলেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল—কেন ডেকেছিলেন ভাই? আমি বললাম—এমনি।

তারপর কাশী ফিরে গেলাম। প্রভু মহারাজ গিয়েছিলেন ওখানে। আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, শরৎ মহারাজ কাউকে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন জানেন আপনি? বললাম—হ্যাঁ জানি। কাউকে কাউকে দিয়েছিলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—কাকে কাকে দিয়েছিলেন? বললাম—এর বেশি আমি আর কিছু এখন বলতে পারব না। উনি আর কিছু বললেন না।

শরৎ মহারাজ যখন আমায় সন্ন্যাস দেন, যোগীন মা, গোলাপ মা, গগন মহারাজ জানতেন। নিচে যে-সাধুরা ছিলেন তাঁরা আঁচ করেছিলেন। সকলেই বলাবলি করছেন—কার সন্ন্যাস হল ভাই? কপিল মহারাজ জানতেন। উনিই তো সব জোগাড়যন্ত্র করে দিয়েছিলেন।

আমি ইচ্ছা করেই প্রভু মহারাজকে বলিনি যে আমাকে শরৎ মহারাজ সন্ন্যাস দিয়েছেন। তবে উনি বুঝে নিয়েছিলেন। শঙ্করানন্দ মহারাজ জানতেন। তারপর আমাকে উনি চিঠি দিলেন—তোমাকে এবার আসতে হবে—মঠ হবে। তুমি ওদের একটু দেখাশোনা করবে।

আমি আর কী করব তখন! এলাম অক্টোবর মাসে। [মৃগাঙ্কমোহন] সুরেদের সি আই টি রোডের বাড়িতে থাকা হল। শঙ্করানন্দ মহারাজকে লিখেছিলাম, আমি তো এতদিন ঠাকুর ও মাকে পূজা করতাম। এখন কি এই ঠাকুর-মার ছবি নিয়ে যাব, না কী করব? মহারাজ আনতে বললেন। আমার ঠাকুরই ওখানে বসলেন। মহারাজ বসালেন। উনি আমাকে একটা কাগজে মোড়া জিনিস দিয়ে বলেন—ইচ্ছে হয় তো পোরো।

পরে দেখি, ওটা গেরুয়া কাপড়।

মঠপ্রতিষ্ঠা যেদিন হয়, বেলুড় মঠ থেকে মহারাজরাই সব গুছিয়ে দেন। আমরা তো কিছুই জানি না। কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আড়াই হাজার মেয়েরা প্রসাদ পেয়েছিল। মঠে যে-ঠাকুর ভোগ রান্না করত তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে ভোগ রান্না করল। শঙ্করানন্দ মহারাজ, মাধবানন্দ মহারাজ, বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ, প্রভু মহারাজ, শান্তানন্দ মহারাজ—সব বড়রাই এসেছিলেন। বিরাট প্যান্ডেল হয়েছিল। মহারাজদের মাটির প্লেটে করে খাবার দেওয়া হয়। নটার সময় তো পূজায় বসা হল। শঙ্করানন্দ স্বামী ঠাকুরকে বসালেন। রেণু [পরে প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা] পুজো করে। মহারাজরা কী গুছানোই গুছিয়ে দিয়েছিলেন সব! নতুন সংসারে যেমন সবকিছু দরকার হয়, তেমন। প্রভু মহারাজ খুব খেটেছিলেন। শঙ্করানন্দ স্বামী ঠাকুরের বাসন-কোসন ও অনেক জিনিস দিয়েছিলেন। গেটে নহবত বসেছিল। গেট খুব সুন্দর করে সাজানো হয়। অনেক হাঁড়ি দই, মিষ্টি—এত জিনিস বেঁচেছিল যে পরে সব বেলুড় মঠে পাঠানো হয়।

তারপর একদিন সব সাধুদের সবস্ত্র ভাণ্ডারা দেওয়া হল। শঙ্করানন্দ মহারাজ তো কিছুতেই রাজি হবেন না! আমি খুব জোর করলাম। আশা, লক্ষ্মী*,

* যথাক্রমে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা এবং শ্রদ্ধাপ্রাণা।

রেণু ওরাও বলল—মহারাজ, আর কি হবে? এই সঙ্গে হয়ে যাক। মহারাজ বলেছিলেন—পরে হবে। শেষে মত দেন। দেড়শো জন সাধু ও ব্রহ্মচারীর আসার কথা ছিল। কিন্তু পঁচাত্তর-আশি জন এসেছিলেন। বাকিদের কাপড় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মায়ের শেষ অসুখের সময় একদিন খুব কেঁদে মাকে বলেছিলুম, ''আপনি চলে গেলে কিছুতেই থাকতে পারব না।'' মা বললেন, ''আমার কাছেই তো যাবে। তবে আমার কিছু কাজ আছে, তা করে তারপর যাবে।'' এখন বুঝছি মা এই কাজ আমার জন্য রেখেছিলেন।

* * *

ভারতীপ্রাণামাতাজীর মুখে সৎপ্রসঙ্গ

তোমার মনকে তুমি যেমন চালাবে তেমন চলবে। মনের ধর্মই তো চঞ্চল হওয়া। মন কি স্থির হয়? মন স্থির হল তো হয়েই গেল। মনকে বেঁধে রাখতে হয়। মন-লাগামকে জোর করে ধরে থাকতে হয়। লাগাম আলগা হলেই মন যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চলে যাবে। কেমন করে মনকে ধরতে হয় জানো? জপ করতে বসে মনকে বলো যে, এখন আর অন্য কোনও কথা নয়। এখন শুধু ইষ্টের চিন্তা করতে হবে। মনকে জোর করে বলবে—এখন তুমি অন্য কোনও বিষয় ভাববে না। মন যদি এদিক ওদিক যায় তাহলে তক্ষুনি আবার মনকে ইষ্টের পাদপদ্মে টেনে আনবে। খুব সচেতন থাকতে হবে যাতে মন যেন অন্য কোনওদিকে যেতে না পারে। এইভাবে মনের সঙ্গে জোর করতে হবে। জোর করতে করতেই ঠিক হবে। সাধন না করলে কি ভগবানের দর্শন মেলে? সাধন চাই। ঠাকুরের সন্তানেরা কত সাধনভজন করেছেন! স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—কীভাবে সাধনভজন করতে হবে।

বেশিক্ষণ একভাবে বসতে না পারা, হাঁটু মুড়ে বেশিক্ষণ বসতে না পারা—ওসব তো হবেই। ওগুলোই তো বাধাবিঘ্ন—মানুষকে ভগবানের পথে যেতে বাধা দেয়। তবে এসব হলেও ছেড়ে দিতে নেই। জোর করে বসতে হয়। জোর করে বসে থাকতে থাকতে পরে অভ্যাস হয়ে যাবে। খুব বেশি কষ্ট হলে পা তুলে তুলে বসতে হবে বই কী! এই দেখো না আমার এখন বাতের জন্য পা মুড়ে বসতে কষ্ট হয়—বেশিক্ষণ বসতে পারি না। তবে জোর করে 'আসনে এতক্ষণ একভাবে বসব' বলে বসে থাকতে চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা না করলে হবে না। অভ্যাস হয়ে গেলে আর কোনও কষ্ট হবে না। নিষ্ঠাভরে অভ্যাস করলে সময়ে ঠিক হবেই।

অনুরাগ, ব্যাকুলতা না হলে ভগবানের চিন্তায় মন স্থির হয় না। আর মন যখনই স্থির হয়ে যাবে তখন তো হয়েই গেল। যখন ঠাকুরের নাম নিয়েছ তখন এটা ঠিকই যে এর কিছুই মিথ্যা বা বিফলে যাবে না। একদিন না একদিন এর সত্যতা বুঝতে পারবে। অনুরাগ নিয়ে, ব্যাকুল হয়ে খুব করে তাঁর নাম জপ করতে হবে। নিষ্ঠাভরে নাম করতে করতে তাঁর প্রতি ভালবাসা জন্মাবেই। ঠাকুরের কাছে এইভাবে কাতরভাবে প্রার্থনা করে বলতে হবে—ঠাকুর তুমিই এনেছ—তুমি এখন সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে তোমার পাদপদ্মে ভক্তি-ভালবাসা দাও। বিবেক, বিশ্বাস দাও। কেঁদে কেঁদে বলতে হবে—তুমি দেখা দিয়ে বুঝিয়ে দাও। আমি এ-সংসারের কিছুই বুঝি না—শুধু তোমাকে বুঝতে চাই। তুমি না বুঝিয়ে দিলে আমি কি করে বুঝব! তুমি কৃপাময় প্রভু—তুমি আমাকে কৃপা করো। একটি বার দেখা দাও। ঠাকুর কীভাবে নিজে মুখ ঘষে ঘষে কাঁদতেন আর বলতেন—মা, আর একটা দিন চলে গেল, এখনও দেখা দিলি না মা? সকলে ভাবত পাগল!

এইভাবে কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

ঠাকুর বলতেন বড়লোকের বাড়ির ঝিয়ের মতো থাকতে। সে কেমন বাবুর ছেলেদের নিজের ছেলে বলে আদর করে কিন্তু মনে জানে, এরা কেউই তার আপন নয়। সেরকমভাবে তুমিও ভাববে যে, সব কাজ, সকলই তাঁর—আমি তাঁর সংসারে রয়েছি। তাঁর সেবায় রত। সর্বদা মনে প্রাণে তাঁর নামে ডুবে থাকবে। অবিরত তাঁর নাম জপ করবে—তাঁতেই মন যখন নিবিষ্ট হবে তখন সংসারের অন্য বিষয় থেকে মন আপনি সরে যাবে।

প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী, ১৯৬৫

শ্রীশ্রীঠাকুর ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চান না এবং অনেককে সেই ভালবাসার দ্বারাই টানছেন। তাঁকে ডাকতে ডাকতে তাঁর প্রতি ভালবাসা হলে তবেই শরণাগতের ভাব আসে। মনে যেসব অঙ্কট বঙ্কট ওঠে তাঁকে ডাকতে ডাকতে তা সব চলে যায়।

তাঁর প্রতি অনুরাগ, ভালবাসা আনাটাই তো সারাজীবনের সাধনা। তাঁর কাছে তা-ই তো প্রার্থনা করতে হবে। তাঁকে ভালবাসতে হবে। তাঁকে ডাকার মতো ডাকতে হবে। জোর করে তাঁকে বলতে হবে—তুমি যখন নিয়ে এসেছ তখন আমাকে ভালবাসা দাও। তোমাকে যেন অনুরাগভরে ভালবাসতে পারি। কারও প্রতি যেন আসক্ত না হই। তুমি কৃপা করে তোমার প্রতি ভালবাসা এনে দাও।

তোমরা কেন তবে মা-বাবাকে কাঁদিয়ে এসেছ? যদি না তাঁকেই ডাকবে—তাঁকেই ভালবাসবে? জোর করে বলতে হবে—ঠাকুর, আমায় বুঝিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও। আমি কিছু বুঝি না, জানি না। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তুমি আমাকে তোমার পায়ে স্থান দাও। তাঁকে তুমি যা বলে ডাকো তিনি তাতেই সাড়া দেবেন। বাবা বলো, মা বলো, যা বলো। তবে বাবার চেয়ে মার অনেক জোর—মা বলেই ডাকো। মা তো সব আবদার সহ্য করেন। তাঁকে জোরে 'মা, মা' বলে ডেকে ডেকে অন্তরের কথা বলো—তিনি শুনবেনই শুনবেন। তিনি অন্তরের অন্তরে রয়েছেন কিনা! তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকো। তাঁকে বলো—আমি তোমার শরণাগত, এখন তুমি তোমার যেমন ইচ্ছা সেইমতো আমাকে কাজে লাগাও।

হাজার হাজার জপ করলেও মনটা অন্যদিকে চলে যেতে পারে, তবু নিষ্ঠাভরে জপ করে যেতে হবে। এর ফল নিশ্চয় আছে। এতে মনটা খুব একাগ্র হয়। অভ্যাস করতে করতে পরে মন আর কোথাও যেতে পারবে না।